তিন বাঁড়ুজ্যে
যাঁদের দেখেছি / যাঁকে দেখিনি
সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়

তারাশঙ্কর, মানিক আর বিভূতিভূষণ—বাংলা সাহিত্যের এই তিন বাঁড়ুজ্যে তথা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের মধ্যে প্রথম দুজনকে আমি দেখেছিলাম; কিছুক্ষণ কথাও বলেছি তাঁদের সঙ্গে। দুর্ভাগ্য যে বিভূতিভূষণকে আমি দেখিনি। তবে মৃত বিভূতিভূষণকে দেখার একটা সুযোগ হয়ত আমার ছিল। ১৯৫০ সালের শীতকাল। তখন ইণ্টারমিডিয়েট পড়ি। বাবার অসুখ, আছেন ফুলডুংরি টিলার পাদদেশে লরি সাহেবের বাংলোয়, সঙ্গে মা। ওঁদের দেখতে গেছি। দ্বিতীয় দিন গোপালপুরার ভেতর দিয়ে ভোরবেলা হেঁটে যাচ্ছি সুবর্ণরেখার দিকে। একটি রাংচিতার বেড়া দিয়ে ঘেরা একহারা স্যাঁতসেঁতে পুরনো বাড়ি—চুনকামের শাদা উঠে গিয়ে কলির নীলাভা ফুটে রয়েছে তার সর্বাঙ্গে। ভোরের কুয়াশার মধ্যেও নদীতীরে, নির্জন একহারা একতলা বাড়িটি খুবই রহস্যময় লেগেছিল। কারণ, সেই বাড়ির সামনে ছিল আদিবাসীদের একটি মূক জটলা। এত স্তব্ধ কেন বাড়িটি? আমার তখনই মনে হয়েছিল। সেবার ছিলাম দিনতিনেক। পরে অনেকবার ঘাটশিলায় গেছি। জেনেছি, সেটাই ছিল গৌরীকুঞ্জ। সময় মিলিয়ে বুঝেছি, হয়ত বিভূতিভূষণের মৃতদেহ তখনও শায়িত ছিল সেই স্তব্ধ শাদা বাড়িটির ভিতরে। উনি মারা যান হৃদরোগে ১ নভেম্বর ১৯৫০ রাত ৮-১৫ মিনিটে। অবশ্য, ভাই ডাঃ নুটুবিহারীর শবও হতে পারে। সুবর্ণরেখা নদীতীরে নুটুবিহারী আত্মহত্যা করেন ৮ নভেম্বর।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমি প্রথম দেখি বরানগরে, গোপাললাল ঠাকুর রোড-সংলগ্ন এক মাঠে উনি তখন হুইস্‌ল্ বাজিয়ে ফুটবল খেলাচ্ছিলেন ক্লাবের ছেলেদের। পরনে ছিল হাফপ্যাণ্ট। গায়ে গেঞ্জি। তারপর একদিন সাহস করে ওঁর বাড়িতে যাই। ১৯৫১ সালের কথা। বরানগরের দীপেন্দ্রনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (লেখক দীপেন্দ্রনাথ নন) আমার সঙ্গে কলেজে পড়ত। কোন কলেজে পড়ি জানতে চেয়ে ও জেনে মানিকবাবু আমাদের ভেতরে আসতে বলেছিলেন বোধহয় সতীর্থ মনে করেই, কারণ উনিও ওই কলেজের। এখন কারা পড়াচ্ছেন, উনি আছেন কিনা, তিনি আছেন কিনা, এসব জানতে চাইলেন।

সেদিন মানিকবাবু ছিলেন এক ঘোর সমস্যার মধ্যে। আর সেই কথাই বললেন। হয়েছে কী, ওঁর টাকার দরকার খুবই। এদিকে একটি উপন্যাস লিখে ফেলেছেন এবং সেটা শেষ করতে না করতে পূজাসংখ্যা এসে গেছে। এদিকে গল্পের দাবি এখনও দশটা এবং সেগুলো লেখা হয়নি। বলেছিলেন, এখন উনি ভাবছেন, কী করলে টাকার অঙ্কে লাভ বেশি। উপন্যাসের জন্য পাবেন ৭৫০ টাকা। এদিকে ১০টি অধ্যায় ছিঁড়ে আলাদা আলাদা গল্প হিসেবে যদি বিক্রি করেন, তাহলে ১৫০০ টাকা পাওয়া যেতে পারে। এইরকম কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় ওঁর বাসাবাড়ির ছোট্ট টেবিল, চেয়ার ও একটি তক্তাপোশ-সম্পন্ন ঘরে ওঁর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা। বলা বাহুল্য, এটাই ওঁর একাধারে লেখার ঘর। বস্তুত, চেয়ারে বসে উনি কলমে ক্যাপ আটকালেন। এতদিন পরেও মনে পড়ে, কালির দোয়াতটি ছিল সুলেখা কোম্পানির। আমি

কলেজে সেকেণ্ড ইয়ারের ছাত্র। কিন্তু বেশ কিছু মানিকবাবু তখনই পড়া হয়ে গেছে। 'পুতুল নাচের ইতিকথা' (পরে ৫ বার পড়েছি), 'চতুষ্কোণ' (৩ বার), 'পদ্মানদীর মাঝি' (বার চারেক) , আর 'দিবারাত্রির কাব্য' (কতবার যে পড়েছি মনে নেই)। এখনও অংশত পড়ে থাকি। আমি মানিকবাবুর বই হস্তান্তর করি না। এবং কবার সম্পূর্ণ পাঠ হল তা চিহ্নিত করে রাখি।

২.

'দিবারাত্রির কাব্য' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ২১ বছর বয়সের রচনা। ভূমিকার প্রথম লাইনেই লেখক লিখছেন, "শুধু প্রেমকে ভিত্তি করে বই লেখার সাহস ঐ বয়সেই থাকে।" শুধু লেখার কেন, প্রেম করার সাহসও।

'দিবারাত্রির কাব্যে' প্রেম নিয়ে আনন্দ-হেরম্বের সংলাপে যে ডিস্‌কোর্স, অমনটা অন্তত বাংলা সাহিত্যে আর নেই। পুরীতে সমুদ্রতীরের আশ্রমে (আশ্রমমাতা আনন্দর মা) হেরম্ব কথায় কথায় বলেছিল, তাদের দুজনের সংসার হলে কাজকর্ম সে খুব একটা করে উঠতে পারবে না। বলে ফেলেছিল, 'আলসেমিকে আমি প্রায় তোমার সমান ভালবাসি আনন্দ।" যেই না বলা—"ভালোবাসো নাকি আমাকে?"—আনন্দর কণ্ঠস্বর হেরম্বকে চমকে দিল।

বিশ্বসাহিত্যের বিভিন্ন নায়ককে এরকম প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছে। বিশেষ করে মনে পড়ছে আল্‌ব্যের কামুর 'দা আইটসাইডার' বা 'দা স্ট্রেঞ্জার'-এর কথা। মারসো তখন খুনটুন করে জেলে। ফাঁসির রায় বেরিয়ে গেছে। ভিজিটিং আওয়ারে গরাদের ওপারে সে। মাঝখানে অনেকখানি ফাঁক। প্রেমিকা মারিয়ার সঙ্গে যেটুকু কথাবার্তা, সবই হচ্ছে ঈষৎ চেঁচিয়ে। কথায় কথায় মারিয়া জানতে চেয়েছিল, "তুমি কি আমাকে ভালোবাসো?" একটু চেঁচিয়েই বলতে হয়েছিল মারসোকে—"শব্দটা আমার কাছে অর্থহীন।"

কামু নোবেল পান ১৯৫৬ সালে। দু-এক বছরের মধ্যে অনুদিত হয়ে বইটি কলকাতায় এসে যায়। দিবারাত্রির কাব্য : ১৯৩৪। এখানের নায়ক যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আসামী—যদিও সেই অর্থে খুন করেনি, জেলেও নেই। প্রেম? মানুষের নব ইন্দ্রিয়ের এই নবলব্ধ ধর্ম? ১৯৩৪-এর নায়ক হেরম্ব জানে, প্রেম অনেক সৃষ্টি করেছে—অনেক দিন ধরে, আর কিছু সৃষ্টি করার ক্ষমতা তার নেই। মারসোর অনেক আগে হেরম্ব এসব জেনে রেখেছিল।

রাত তখন ১০টা, যখন আশ্রমে হেরম্ব এল আনন্দর ঘরে। জুতো খুলে সে সোজা আনন্দর বিছানায় শুয়ে পড়ে। লণ্ঠনের এত কাছে আনন্দ বসেছে যে তাকে মনে হচ্ছে জ্যোতির্ময়ী। আলো যেন লণ্ঠনের নয়।...

আনন্দ বলল, "অত বোকা নই বুঝলেন? এমনি করে কথা এড়িয়ে যাবেন সে হবে না। রোমিও-জুলিয়েট বেঁচে থাকলে তাদের প্রেম অল্পদিনের মধ্যে মরে যেত কী করে জানলেন বলুন।"

হেরম্ব জবাব দিয়েছিল, "বুদ্ধি দিয়ে জানলাম।"

—"শুধু বুদ্ধি দিয়ে?"

—"শুধু বুদ্ধি দিয়ে, আনন্দ! বিশ্লেষণ করে।"

তারপর...

"আনন্দের বালিশ থেকে সদ্য আবিষ্কৃত লম্বা চুলটির একপ্রান্ত আঙুল দিয়ে চেপে ধরে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে হেরম্ব সেটিকে সোজা করে রাখল।"

বছরখানেকের মধ্যে লেখা তিনটি উপন্যাস ও একটি গল্পগ্রন্থ (১৯৩৪-৩৫)। গল্পসহ বাকি তিনটি উপন্যাস সাধু ক্রিয়াপদে তথা সাধু ভাষায় লেখা হলেও শুধু এই একটি উপন্যাস চলিত ক্রিয়াপদে, একেবারে কথ্য ভাষায়। ক্রিয়াপদ যাই হোক, ডিক্‌শনের দিক থেকে দেখলে বোঝা যাবে, তিনটি উপন্যাস সম্পূর্ণ আলাদা তিনটি গদ্যে লেখা। যেন তিন জন আলাদা লেখক। এক বছরের মধ্যে তিনটি উপন্যাসে তিন-তিনটি আলাদা বাংলাভাষা—সত্যি, কী ভয়ঙ্করভাবে ভার্সেটাইল এই লেখক! পৃথিবীর সাহিত্যে এমন উদাহরণ কী আছে? খোলস ছেড়ে তিন মাথাওলা সাপ—সেই একবারই। অন্তত বাংলা সাহিত্যে তাকে আর কখনও দেখা যায়নি।

এই যে আনন্দর সুদীর্ঘ কেশদামের মাত্র একটি ফুঁ দিয়ে সোজা করে রেখে বলা, এমনি ভাবেই হেরম্ব যা বলার আগাগোড়া বলে গেছে—কোনো না কোনো ভুল প্রতিপাদ্যের চুল ফুঁ দিয়ে সোজা করে রেখে। "সব হাসির কথা আধ মিনিটে পচে যায়"—সে অন্যত্র বলেছিল। বস্তুত, গোটা 'দিবারাত্রির কাব্য' যতখানি গল্প, ততখানি আলোচনা-বিশ্লেষণ। এ যেন একদিকে বাটখারা (ডিস্‌কোর্স), অন্যদিকে মাল—একদম কাঁটায় কাঁটায়। আনন্দর পায়ের পাতায় তখন একটি পিঁপড়ে। মন্দিরের চাতালে যজ্ঞানলের চারিদিকে ঘুরে ঘুরে নাচতে নাচতে আগুনে ঢলে পড়ার আগে, তখনো আনন্দ মন্দিরের সিঁড়িতে বসে। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ ও মধ্যরাত্রি।

একটা নিরীহ ছোট্ট পিঁপড়ে আনন্দের পায়ের পাতায় উঠে পড়ে তার ক্ষীণতম অস্তিত্বকে ঘোষণা করে হেরম্বের চেতনায়। "হেরম্ব তাকে স্থানচ্যুত করতে গিয়ে হত্যা করে ফেলে।"

মনে রাখতে হবে, তৃতীয় পর্বে সমস্ত ঘটনা ঘটছে পুরীর সমুদ্রতীরে। হেরম্বের বউ আত্মহত্যা করেছে; মতান্তরে হেরম্ব খুনী। ঠিক যেমন কামুর নায়ক মারসো। একটু আগে ফিরে আসার জন্য প্রেমিকা সুপ্রিয়ার মর্মস্পর্শী আবেদন সে সমুদ্রজলে ঠেলে দিয়েছে। সুপ্রিয়া চলে গেছে। তারপর দু-হাতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াবার জন্য দুই করতলে রাত্রির শীতল বালি স্পর্শ করে তার মনে হল, "যে পৃথিবীর সবুজ তৃণাচ্ছাদিত হবার কথা ছিল, আজ তার সবটাই মরুভূমি।"

"প্রাতে বন্ধু এসেছে পথিক
পিঙ্গল সাহারা হতে করিয়া চয়ন
শুষ্ক জীর্ণ তৃণ একগাছি
ক্ষতবুক তৃষার প্রতীক
রাতের কাজললোভী কাতর নয়ন
ওষ্ঠপুটে মৃত মৌমাছি।"

'দিনের কবিতা', 'রাতের কবিতা' ও 'দিবারাত্রির কবিতা' এই তিন পর্বে উপন্যাসটি

বিভক্ত। প্রতি পর্বের সূচনাতেই একটি করে কবিতা। এইটি দিয়ে প্রথম পর্বের শুরু। শুধু কবিতা হিসেবেই বাংলা কাব্যে এর জন্য একটা আসন পাতা আছে।

'দিবারাত্রির কাব্য' উপন্যাসের ভূমিকাটিও শিল্পসাহিত্য নিয়ে একটি সাতরাজার ধন এক মানিক। মানিকবাবু লিখছেন :

> ''দিবারাত্রির কাব্য পড়তে বসে যদি কখনও মনে হয় বইখানা খাপছাড়া, অস্বাভাবিক—তখন মনে রাখতে হবে, এটি গল্পও নয়, উপন্যাসও নয়—রূপক কাহিনী। একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে, বাস্তব জগতের সঙ্গে সম্পর্ক দিয়ে সীমাবদ্ধ করে নিলে মানুষের কতকগুলি অনুভূতি যা দাঁড়ায় সেইগুলি কেউ মানুষের নয়—মানুষের projection—মানুষের এক টুকরো মানসিক অংশ।''

যা আমরা 'অবাস্তব' মনে করে বিশেষত গদ্যসাহিত্যে এড়িয়ে চলি, মাত্র ২১ বছর বয়সে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে যাচ্ছেন, সেই অবাস্তবতাকে বাদ দিয়ে যা, সেগুলি কেউ মানুষের নয়। 'দিবারাত্রির কাব্যে'র এই ভূমিকাটুকু আধুনিকতা এপিটাফ হবার যোগ্য।

মানুষের কীসে ভালো হবে, মানুষের সমস্ত তত্ত্ব ও দর্শন বা জিজ্ঞাসা-র উৎস এখান থেকেই। কিন্তু এ-ও তো একটা সীমার মধ্যে বেঁধে ফেলা মানুষের চিন্তা, মানুষের উপলব্ধির অনন্ত আকাশকে। মানুষের ওড়ার আকাশকে কেবলমাত্র তার জন্য শুভচিন্তার মধ্যে সীমাবদ্ধ করে নিলে সে-ও তো আর আকাশের কেউ নয়—আকাশের ওপারে যে আকাশ, তার একটা প্রোজেকশন মাত্র। কেননা, কে জানে, গরলই প্রকৃত পানীয় কিনা? হয়ত অমৃতই বিষ!

আগেই বললাম, 'দিবারাত্রির কাব্য' তিনভাগে বিভক্ত। প্রথম দুটি ভাগ 'দিনের কবিতা' (সুপ্রিয়া), 'রাতের কবিতা' (আনন্দ)। গরলজ্ঞানে রূপাইকুড়ার দারোগার বউ সুপ্রিয়াকে পিছনে ফেলে নায়ক হেরম্ব পুরীর সমুদ্রতীরে এসে পান করতে চাইল অষ্টাদশী আনন্দের অমৃত। তৃতীয় ভাগে 'দিবারাত্রির কাব্য'। দুজনের কে যে ছিল অমৃত আর কে যে গরল, তা আর নির্ণীত হল না।

৩.

মানিকবাবুর সঙ্গে আমার মোট তিনবার দেখা হয়েছিল। একবার ৪৬ ধর্মতলা স্ট্রিটে দেখা হয় প্রগতি লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ তথা গণনাট্য সঙ্ঘের অফিসে। সেটা ১৯৫২-৫৩ই হবে; সলিল চৌধুরী 'পাল্কি চলে' গানটিতে সদ্য সুরারোপ করেছেন। সেদিন হারমোনিয়ম কোলে তুলে গেয়ে শোনালেন। তখনও মিটিঙে গাওয়া শুরু হয়নি। রেকর্ড তো অনেক পরে হবে। নবেন্দু ঘোষ পড়লেন 'জ্বর' গল্পটি। তারপর মানিকবাবু পড়লেন একটি গল্প—'চোর'। কলকাতার একটি বাসাবাড়িতে ছোটোখাটো চুরি হয়েছে—সেই নিয়ে তোলপাড়, ঝিকে লাঞ্ছনা, চাকরকে মারধোর। রাতের অন্ধকারে পুলিশ এসে সে-বাড়ির ছোট ছেলেকে ডি.আই.আর-এ ধরে নিয়ে গেল—সে ছিল বন্ধ কারখানার প্রতিবাদী শ্রমিক।

দ্বিতীয়বার বরানগরের বাড়িতে। আমি জানতে চেয়েছিলাম, 'আচ্ছা, মাঝিদের সঙ্গে আপনি তো বহুরাত পদ্মায় কাটিয়েছেন, তাই না?'

'রাতে?' —উনি শুনে অবাক, 'আমি দিনেও কখনও কাটাইনি।'

—'আপনি ওদের চিনতেন না?'

—'ওই কুমিল্লায় থাকতে দু-একবার ওদের সঙ্গে বিড়িটিড়ি টেনে ছিলাম আর কী!'

—'ডাঙায়?'

'না তো কী?' মানিকবাবু বলেছিলেন (হেসে), 'নদীতে? ওসব মাঝি-মাল্লা আমি চিনি না। তাছাড়া আমার বাবা ছিলেন সাব-ডেপুটি কালেক্টর—দুমকা, আরা, সাসারাম ওসব দিকে। আমার জন্মই তো দুমকায়। ওখানে পদ্মা কোথায়? নদী কোথায়? মাঝি কোথায়? আর থাকলেই বা ছোটলোকদের সঙ্গে বাবা মিশতে দেবে কেন?'

বস্তুত, পদ্মানদীর মাঝিদের সঙ্গে উনি বিস্তর ওঠবোস করেছিলেন হেন তথ্য কোথাও পাওয়া যায় না। যাঁরা প্রতিভাবান লেখক, তাঁদের পক্ষে এভাবে 'পদ্মানদীর মাঝি' সম্ভব হয়। প্রকৃত যে অভিজ্ঞতা তা সূর্য যেন। প্রথমে দেখা দেয় অরুণোদয়ের আলো। তারপর একটু একটু করে কাহিনী ফুটে ওঠে। চরিত্রগুলি একে একে দেখা দেয়। বেলা যত বাড়ে, তাদের ছায়া বাড়ে। এর ছায়া গিয়ে ওকে ছোঁয়। (দ্র. 'পদ্মানদীর মাঝি')। যেমন, 'পুতুল নাচের ইতিকথা'র পাতাগুলো। এ ওর আলো, ও এর ছায়া মাখে।

পদ্মানদীর মাঝি এমনি এক সূর্যস্নাত রচনা। কুবের এমনি এক সৌরসন্তান, যদিও কৌন্তেয়। এখানে লেখক হচ্ছেন সূর্য। আর বিষয় হল কুন্তী। কুমারী কুন্তী জবাকুসুমসঙ্কাশে এসে চোখ বোজে, ধর্মাধর্ম হারায় ও সন্তানধারণ করে।

কোনো উপন্যাসের জন্য মানিকবাবুকে তথাকথিত অভিজ্ঞতার দ্বারস্থ হতে হয়নি। ওসব সমরেশ বসুদের প্রয়োজন হয়। 'আমার সাহিত্য জীবনে' তারাশঙ্করও হাস্যকরভাবে বারবার জানাতে চাইছেন—ইহা সত্য, কারণ ইহা বাস্তব, আমি স্বচক্ষে ইহাদের এইসব দেখিয়াছি। 'কবি'র বসন ঠাকুরঝি, পয়েন্টসম্যান রাজন, নিতাই কবিয়াল সব ওঁর চর্মচোখে দেখা চরিত্র! যেন বলার খুব দরকার ছিল। বাংলার গ্রাম ধ্বংস হয়ে গেলে, যাঁর লেখার লাইন ধরে গ্রাম পুনর্নির্মাণ করা যাবে, তাঁর মুখে একথা কি মানায়?

সমরেশ 'গঙ্গা' লেখার আগে দুই-এক মাস গঙ্গার মোহনায় কাটিয়ে এসেছেন। জেনে এসেছেন, কাকে বলে 'জালেঙ্গা জাল' আর কাকে 'বাঁধাছাঁদি জাল'। যেন কনে দেখে এলেন। মানিকবাবুর এসব কিছুই জানার দরকার হয়নি। তবু মণিরত্নমের বিখ্যাত ছবির গানের ভাষায় জানতে চাই, বলুন, শাদীকে বাদ ক্যা ক্যা হুয়া। তারপর তো বহু জল বয়ে গেল গঙ্গা আর পদ্মা দিয়ে। বলুন, কৌন জিতা কৌন হারা? গঙ্গা না পদ্মা?

৪.

আর একবার মানিকবাবুকে দেখেছিলাম বারদুয়ারিতে। দেওয়ালে তখনও সম্রাট ষষ্ঠ জর্জের ছবি—বারোটি দরজা দিয়ে তখনো প্রবেশ করা যেত তিমির তলপেটের মতো রানী

রাসমণি রোডের সেই গভীর শুঁড়িখানায়। একটি অনুজ্জ্বল ডুমের নিচে ঘননীল ধোঁয়ার মধ্যে উনি বসেছিলেন। সামনে একটি দেশি মদের বোতল। একা।

শেষবার দেখি ডিসেম্বর ১৯৫৬। তখন দুপুরবেলা। কমিউনিস্ট পার্টির সার্কুলার রোডের অফিসে। কর্পোরেশনের চাকরিতে ক-মাস হল ঢুকেছি। আমরা ক-জন অফিস থেকে মালা নিয়ে গেলাম। দেখলাম, উঁচু-করা খাটের ওপরে শুয়ে আছেন। একে একে আসছেন জ্যোতি বসু, ভূপেশ গুপ্ত, গীতা ও বিশ্বনাথ মুখার্জি, সোমনাথ লাহিড়ী। কে যে নেই! সকলেই হাত মুষ্ঠিবদ্ধ করে লাল সেলাম জানাচ্ছেন। লাল পতাকার ওপরে মালা জমে জমে,পাথর। তরুণ সাহিত্যিকেরা এসেছিলেন দলে দলে। বুদ্ধদেব বসু এলেন। 'ফুলগুলো সরিয়ে নাও আমার লাগছে' পরের সংখ্যা 'পরিচয়ে' বেরুল, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের আবেগময় কবিতা, 'এপিটাফ' হিসেবে যা প্রায় 'দাঁড়াও, পথিকবরে'র মতোই বিখ্যাত। কিন্তু আমার মনে হয়, মানিকবাবু এই মেটাফরময় মায়াকান্নার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। তাঁর যোগ্য 'এপিটাফ' তো তিনি স্বয়ং রচনা করে গেছেন :

> "শব্দমদ বেচা শুঁড়িগুলো
> কাব্যলক্ষ্মীর দেহ চিরদিন কচি রেখেছিল
> শুঁড়িগুলো সব নিপাত যাক
> কাব্যলক্ষ্মীর দেহে যৌবনের জোয়ার ঘনাক।"

অহো, কী অনির্বচনীয় বিরোধাভাস ওই ক-টি মাত্র পঙক্তিতে—যেন সপাং সপাং চাবুক পৃথিবীর পণ্যসাহিত্যকে, 'তিন পেনির পালা'য় যেন ব্রেশ্‌টের গান একটি।

মনে পড়ে, 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র বুকম্যান-প্রকাশিত সংস্করণের চতুর্থ কভারে বলা হয়েছিল—"পৃথিবীর এই বিরাট রঙ্গমঞ্চ মানুষ যেন শুধু পুতুল। কোনও অদৃশ্য হাতের সুতোর টানাপোড়েনে মানুষ নাচে, কাঁদে, কথা বলে...।" বিখ্যাত প্রচ্ছদশিল্পী মাখন দত্তগুপ্ত প্রচ্ছদটিও এঁকেছিলেন ওই নির্দেশে। শুধু প্রচ্ছদশিল্পী কেন, তাবৎ সমালোচকেরা উপন্যাসের নামের দ্বারা আজও বিভ্রান্ত। 'নিয়তি কেন বাধ্যতে'—যেন এটাই বক্তব্য। মানিকবাবু ব্যাপারটা 'কাঁচা বিজ্ঞাপনবিশারদের ধাপ্পাবাজি' বলে ভৎর্সনা করে লিখেছিলেন, "আমি ভাবছি, হায়, যদি বইটার একটা ভূমিকায় লিখে দিতাম মানুষকে কীভাবে পুতুল করা হয়েছে এটা তারই উপন্যাস...এটা মানুষের হাতে পুতুল হবার বিরুদ্ধে মানুষের প্রতিবাদ... তাহলে হয়ত বইখানার পিছনে আমাকে ভাগ্যবাদী বলে প্রকাশক ঘোষণা করতে পারতেন না।" তাই বলছিলাম, তাঁর মৃত্যু নিয়ে সুভাষের ছন্দোবদ্ধ ভাবালুতা মানিকবাবুর নিশ্চয়ই অসহ্য মনে হত।

৫.

তুলনায় তারাশঙ্করের মৃত্যু কত ম্যাড়মেড়ে। ১৯৭১ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর তারাশঙ্কর মারা যান। মাত্র এক মাস আগে ১২ আগস্ট যেখানে গণহত্যা হয়ে গেছে—শতাধিক নকশালপন্থী খুন হয়েছে ওই একদিন রাত্রে—বরানগরে আমাদের ফ্ল্যাটটা ছিল তার কেন্দ্রে। সকালে

রেডিওর খবর শুনে সেখান থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমি টালায় যাই। লেখকদের মধ্যে ওই ঘনঘোর নকশাল আমলে নকশালদের সেই কোর এরিয়ায় একজন লেখকের টিকিও দেখা যায়নি—বিশেষত আনন্দবাজার থেকে সন্তোষকুমার ঘোষ সহ কারুকে দেখিনি। সকলেরই মৃত্যুভয়। কার লাশ কোথায় পড়ে যাবে, কেউ জানে না। শুধু রমাপদ চৌধুরীকে দেখেছিলাম, কিন্তু উনিও শবমিছিলে হাঁটেন নি। তারাশঙ্করের শবযাত্রায় আমি গ্রে স্ট্রিট পর্যন্ত হেঁটেছিলাম—দৌড়েছিলাম বলাই ভালো, কারণ প্রাণভয়ে শোভাযাত্রাটি স্বয়ং দৌড়োচ্ছিল নিমতলা শ্মশানের দিকে। না, একজনও লেখক বা কবি সেই শবযাত্রায় ছিল না। তবু ওরই মধ্যে দেখেছিলাম, শ্যামপুকুর স্ট্রিটের মুখে ৪-৫ জন কৌতূহলী গৃহিণী আগে থেকে দাঁড়িয়ে আছেন। একজন সোজা ছুটে এসেছেন রান্নাঘর থেকে। মনে আছে, তিনি হাতের তেলহলুদ ও মুখের ঘাম শাড়ির আঁচল দিয়ে মুছেছিলেন। সেই মুখটিও মনে পড়ে। উত্তর কলকাতার এক বা দু-কামরা বাসাবাড়ির এইসব ঘর্মাক্ত গৃহবধূর মুখ যে কোনো দুর্গাপ্রতিমার ধড়ে বারবার দেখা যায়। এঁদের জন্য তখনো সপ্তাহে দুটি বাংলা উপন্যাস লাইব্রেরি থেকে আসে। এবং কারা নিয়ে গিয়েছিল সেই শোভাযাত্রা বললে বিশ্বাস করবেন কি? বড়বাজার যুব কংগ্রেস। শবযাত্রী সবাই অবাঙালি। যাত্রাধ্বনি কী ছিল, তা-ও বলছি। জানি, কেউ বিশ্বাস করবেন না, তবু। শবযাত্রার ধ্বনি ছিল-একজন; 'তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়', সকলে মিলে 'অমর রহে!' মৃতদেহ তোলবার সময় এক-আধবার হরিধ্বনি হলেও পথে 'রামনাম সত্য হ্যায়' ধ্বনিই উঠেছিল।

৬.

তারাশঙ্করের সঙ্গে আমি মাত্র একবারই কথা বলেছি। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমি একদিন ওঁর টালার বাড়িতে যাই। তখন বিকেলবেলা। আমি ভেবেছিলাম একজন মুনিঋষিকে দেখব। তার বদলে দেখলাম, যোগভ্রষ্ট তিতিবিরক্ত একজন মানুষ, গলায় রুদ্রাক্ষ, খালি গা, মোটা উপবীত, পরনে লাল পট্টবস্ত্র। 'পূজোয় বসতে যাচ্ছিলাম', উনি আমাকে বলেছিলেন।

১৯৭১ সালের জানুয়ারি। আমার প্রথম মিনিবুক—৩২ পাতা ডাবলপ্যাক সিগারেট প্যাকেটের মতো সাইজ। তখন হৈ-চৈ চলছে মিনিবুক নিয়ে। পি.টি.আই. নিউজ হয়েছে। ভারতের অনেক কাগজেই গণেশ পাইন-কৃত মিনিবুকের প্রচ্ছদের ছবি। আমার গল্পের নাম ছিল 'বিপ্লব ও রাজমোহন'।

আশ্চর্য, দেখলাম তারাশঙ্কর সবই জানেন। কিন্তু যখন ওই মিনিবুক তাঁর হাতে দিলাম, বললেন, 'চারটে কেন?'

—'রেখে দিন। কাউকে পড়তে দেবেন।'

ধীরে ফেরত দিলেন তিনটে কপি। খুব ক্লান্তভাবে বললেন, 'দরকারের বেশি জিনিস রাখবার জায়গা আমার আর নেই।'

আমি 'বিপ্লব ও রাজমোহন' গল্পটির বিষয়বস্তুর নতুনত্ব বোঝাতে গিয়ে (যাতে উনি অবহেলা না করেন বা পড়তে প্রলুব্ধ হন) ওঁকে বলছিলাম, 'দেখুন, এটা আসলে একজন লোক

তার স্ত্রীর অবর্তমানে তার বুক সেলফটা জ্বালিয়ে দিচ্ছে, তারই বর্ণনা—যেভাবে খেলার রিলে হয় আর কী—কারণ, খুব দ্রুত পুড়ে যাচ্ছে তো, তাই সেই দ্রুততা ভাষাতেও এসে যাচ্ছে, ভাষা আর সম্পূর্ণ হতে পারছে না। নায়কের রিলের ভাষাও জ্বলে যাচ্ছে আর কী—শুধু একটা বই-ই শেষ পর্যন্ত পুড়ল না, আর সেটা হল—' এই পর্যন্ত দ্রুত বলে নিয়ে প্রতিক্রিয়ার জন্য আমি চোখ তুলি।

আমি চুপ এবং তারাশঙ্কর চুপ। দেখলাম খর্বকায় হলেও খুব উঁচু হয়ে গেছেন কীভাবে, কোনো অলৌকিক উপায়ে আমাপেক্ষা উচ্চতাবিশিষ্ট হয়ে ঘাড় নেড়ে বললেন, 'অ্যাডভোকেসি কোরো না। লেখার কথা বলবে লোকে। লেখক নয়।' তাঁর মুখ থেকে শোনা দুটি কথাই জীবনের অমূল্য নির্দেশ হয়ে আছে।

৭.

কিন্তু তারাশঙ্কর যখন একতলায় পাশের ঘরে আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন তখন সত্যিই এক অবাক কাণ্ড ঘটেছিল। এমন অলৌকিক ঘটনা আমার জীবনে দুটি নেই।

উঁচু দেওয়ালে (প্রদর্শনীর মতো আই-লেভেলে নয়) সারবন্দী স্বরচিত তৈলচিত্রগুলির একটির দিকে অঙ্গুলিসঙ্কেত করে তারাশঙ্কর আমাকে বলেছিলেন, 'ওই দ্যাখো পাখি।'

—'হাঁসুলিবাঁকের?'

—'হ্যাঁ।'

—'আর ওই যে বসন ...ঠাকুরঝি। আর ওই করালিচরণ। ওরা সব...' —তারপর বাকিটা বিড়বিড়। বা, কথা জড়িয়ে গেল তাঁর।

ঠিক তখনই দেখলাম স্কাইলাইট দিয়ে প্রবেশ করে একটি সূর্যাস্ত-রশ্মি পাখির হাতে ...পাখির মেটেসিঁদুরবর্ণ স্তনবৃন্তটি বনবন করে ঘুরছে বলে মনে হল—ঘোর আক্রোশে পাখি তার স্রষ্টার দিকে যেন একটি বল্লম ছুঁড়ে মারতেই উদ্যত—রক্তিম পট্টবস্ত্রে আর রুদ্রাক্ষ গলায় তারাশঙ্কর সেদিনের সেই মৌনমুখর বিকেলবেলায় কেমন দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে উঠেছিলেন! কী-এক মায়াবী যাদুবল আমাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল এক সময়-ক্যাপসুলের মধ্যে, যেখানে শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যানি আর বৈদিক মন্ত্রধ্বনি, একদিন যেখানে উচ্চারিত হয়েছিল 'মা নিষাদ'! এই ঘটনার কয়েকমাস পরেই উনি মারা যান।

৮.

আগেই বলেছি, বিভূতিভূষণকে আমি দেখিনি। তাঁর মৃত্যুর সময় কিছু না-জেনেই ঘাটশিলায় ছিলাম। স্তব্ধ গৌরীকুঞ্জের পাশ দিয়ে হেঁটে গেছি। তবে প্রথমবার মাত্র তিন দিনের অবস্থানেই গোপালপুরায় সোনা নামে এক সাঁওতাল মেয়ের সঙ্গে আমার প্রেম, যাকে বলে লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট। ওর বাড়ি ছিল বিভূতিভূষণের গৌরীকুঞ্জের লাগোয়া। মা-বাবাকে নিয়ে ফেরার দিনেই হাটফেরত অন্ধকারে সোনা আমাকে অনেক ভালোবাসা জানায়। সোনার টানে তিন

মাসের মাথায় আবার ঘাটশিলায় যাই। সোনা মাতৃহারা। বাবা আসামে। থাকে পিসি আর পিসেমশাই-এর বাড়ি। অভিভাবকেরা কাজে চলে গেলে—সোনা-ই আসত লরি বাংলোয়।

ওর কাছে 'ডাক্তারবাবু'র দাদা সম্পর্কে দ্বিতীয়বারেই এক আশ্চর্য কাহিনী শুনি—নুটুবিহারী ডাক্তারি করতেন। মৃত্যুর কিছুদিন আগে বিভূতিভূষণ বেড়াতে বেড়াতে এঁদেলবেড়ার জঙ্গলের মধ্যে সাঁওতালদের শ্মশানে গিয়ে পড়েন। তখন বিকেলবেলা। সেখানে একটি মুখখোলা কিন্তু আপাদমস্তক মমিসুলভভাবে আঁটা। কাপড় দিয়ে বাঁধা একটি শবদেহ দেখে এক-পা এক-পা করে উনি পিছিয়ে আসেন এবং তারপর দ্রুত হেঁটে হাঁপাতে হাঁপাতে বাড়ি ফেরেন। বাড়ি ফিরে বলেন, শবদেহটির ধড়ের ওপরে ছিল অবিকল তাঁর মুখটিই বসানো। শুধু চশমাটি পড়ে গেছে। আমি সেবারে কলকাতায় ফিরে এই আশ্চর্য ঘটনাটির কথা বন্ধুবান্ধবদের বলি। কিশলয় ঠাকুর 'পথের কবি' বইতে ঘটনাটি পরে লিপিবদ্ধ হয়। এবং ভ্রাতৃবধূ স্বয়ং যমুনা বন্দ্যোপাধ্যায়ও কাহিনীটিকে স্বীকৃতি দিয়ে গেছেন। এই রচনা লেখার আগে বাংলা আকাদেমি-প্রকাশিত রুশতী সেনের বিভূতিভূষণের জীবনীটিও পড়ে নিলাম। সেখানেও ওই কাহিনীর উল্লেখ আছে।

রুশতী সেনের লেখা বিভূতি-জীবনী পড়তে গিয়ে দেখলাম, প্রথমা স্ত্রী গৌরীর মৃত্যুর পরে, অন্তত বছর কুড়ি বিপত্নীক থেকে, বিভূতিভূষণ যখন রমাকে (কল্যাণী) বিবাহ করেন, তখন বিভূতিভূষণের বয়স ৪৬, আর কল্যাণীর মেরেকেটে ১৬। ত্রিশ বছরের ব্যবধান। বিভূতিবাবুর বিবাহিত জীবন মাত্র বছর চোদ্দ।

বিভূতিভূষণ পড়লে আমার বারবার মনে হয়, ওঁর ওই যে মূর্ছিত প্রকৃতিপ্রেম, তা যৌনতা-উত্তর স্নায়ুমূর্ছনার মতোই অবিকল।

প্রথম বিয়ে আমি তড়িঘড়ি তিরিশে না করে ফেললে, মধ্যচল্লিশ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারলে ১৯৫০-এর ১ নভেম্বর ঘাটশিলায় সেই নীলচে-শাদা স্তব্ধ বাড়িটির মধ্যে ঢুকে বিভূতিভূষণের ধড়ে হয়ত আমি দেখতে পেতাম আমার মুখ।

ভবিষ্যৎ অন্যরকম হলে আমার অতীতও কি তদনুযায়ী বদলে যেত না?